



فَاتِر

۲۳۶

ومن يفتت ۳

وَلَنْ يُكَلِّمَهُنَّ كَذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْتُرَّكُمْ الْهَيُودُ  
 الَّذِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ يَا اللَّهُ الْعُرُوفُونَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ  
 عَدُوًّا وَإِنَّمَا تَعْبُدُوا لِيُكْفِرَ لِكُفْرَانِهِمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مِنْ أَسْحَابِ السَّعِيرِينَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ  
 مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَمْسِنَ زَيْنُ لَهُ سَوْءٌ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ حَسَنًا وَإِن  
 اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ عَنْكَ  
 عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ نَبِيًّا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ  
 الرِّيحَ فَتُبَيَّرُ بِهَا مَحَابِلًا فَسَمْتُهُ إِلَى بَلَدٍ مَدِينَةٍ فَأَحْيَيْتَابِهِ الْأَرْضَ  
 بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ مِنْ رِبِّدِ الْعُرَّةِ فَلِلَّهِ الْعُرَّةُ  
 جَمِيعًا إِلَيْهِ يُصْعَدُ الْكَاكِبُ وَالطَّيِّبُ وَالصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ  
 يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْ أَوْلَى لَهُمْ  
 يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ  
 أَزْوَاجًا وَأَتَّخِذُ مِنْكُمْ نَفْسًا وَآخِذُكُمْ بِالْأُغْلَامِ وَمَا يَعْمُرُ مِنْ  
 مُعْتَدٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمرِهِ الرَّاقِي كُنَيْسُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بُيُوتٌ ①

(৪) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও তো মিথ্যাবাদী কলা হয়েছিল। আল্লাহর প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। (৫) হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্শ্বিৎ জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে। এক সেই প্রবন্ধক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (৬) শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহিল্মামী হয়। (৭) যারা কুফর করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৮) যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পঞ্চলট করেন এক যাকে ইচ্ছা সংপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে। (৯) আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান। (১০) কেউ সন্মান চাইলে জেনে রাখুক, সমস্ত সন্মান আল্লাহরই জন্যে। তাঁরই দিকে আরোহণ করে সংবাক্য এক সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। যারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ষ থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে ফুল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এক সন্তান প্রসব করে না, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বস্তু ব্যক্তি বয়স পায় না এক তার বয়স হ্রাস পায় না, কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

পয়গম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহর ওহী ও হুকুম আহকাম পৌছে দেয়। রসূল অর্ধ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ তাআলার মাঝখানে মাধ্যম হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে পয়গম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ তাআলার মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহর রহমত অথবা আযাব পৌছানোর কাজেও ফেরেশতারা মাধ্যম হয়ে থাকে।

أُولَىٰ أَجْمَعَةٍ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرَبِّهِ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা

ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বার বার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আঃ)–এর ছয়শ' পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। — (কুরতুবী, ইবনে কাসীর)

يَزِيدُنِي الْحَقَّ مَالِيَةً — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে

যত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যতঃ এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণের পাখা দু'–চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশী হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবু হাইয়ান বাহুরে মুহীতে এ মতের আলোকেই তফসীর করেছেন। এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহ তাআলার দান ও নেয়ামত। এজন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَلْحَقِّ لَأَنزِلُهَا — এখানে রহমত বলে

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নেয়ামত বোঝানো হয়েছে। যেমন, ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুওয়ত ইত্যাদি এবং রিযিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, ইয়যত-আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা যার জন্যে স্বয়ং অনুগ্রহের দরজা খুলে দেয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কোন কারণ বশতঃ কোন বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেয়ার সাধ্য কারও নেই। — (আবু হাইয়ান)

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تَعْتَرِكُمْ يَا اللَّهُ الْعُرُوفُ — শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ, অতি

প্রবন্ধক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে

প্রতারণিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। ‘শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকা না দেয়’—এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না।—(কুরত্বী)

وَأَنَّ اللَّهَ يُبْدِلُ مَنْ يُشَاءُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ  
ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করেছিলেন : হে আল্লাহ্ ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ্ তাআলা ওমর ইবনে খাত্তাবকে সংপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবু জাহল তার পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

الَّذِي يُصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَةَ وَالصَّالِحَاتِ السَّامِيَةَ  
পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেউ সন্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সাহায্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সন্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে সন্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে সন্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু’টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সংবাক্য অর্থাৎ, কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর সন্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সংকর্ম। অর্থাৎ, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরীয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ আবদুল কাদির (রহঃ) ‘মুয়েহল কোরআনে’ বলেন সন্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর যিকর ও সংকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই যিকর ও সংকর্ম করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সন্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু’টি অংশ ব্যক্ত করার জন্যে বলা হয়েছে : সংবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এবং সংকর্ম তাঁকে পৌছায়। وَالصَّالِحَاتِ السَّامِيَةَ বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার শ্রেণীতে এর ভিন্ন ভিন্ন তফসীর করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সংবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সংকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, যাহহাক, শহর ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহর দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ হোক অথবা অন্য কোন যিকর-তসবীহই হোক— কোনটিই সংকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সংকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও তাঁর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ কিংবা অন্য কোন যিকর মকবুল নয়।

সংকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মাকরুহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত।

অন্তএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক—আল্লাহ্ তাআলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সংকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার যিকর ও কলেমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সংকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা কোন কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়তকে সুনত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না।—(কুরত্বী)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুনত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুনত মোতাবেক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তসবীহ যেমন সংকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সংকর্ম এবং আল্লাহর হুকুম—আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ যেনে চলাও যিকর ব্যতীত ফোটে উঠে না; প্রচুর যিকরই সংকর্মে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

وَأَيُّكُمْ مُمْتَرٌ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمْرِهِ الْأَرْبَعُ كِتَابٍ

অধিকাংশ

তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহহাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেয়া যায়, তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ্ তাআলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়সক্রমে থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু’দিন অতিবাহিত হলে দু’দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তফসীর শা’বী, ইবনে জুবায়ের, আবু মালেক, ইবনে আতিয়া ও সুদী থেকে বর্ণিত আছে।—(রহুল-মা’আনী)

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসায়ী বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্যবহার করা।” বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই :

ঃ ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদারদা (রাঃ) বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আল্লাহ্ তাআলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্

ফাতির

২২

ومن قانت ۲২



(১২) দু'টি সমুদ্র সমান হয় না — একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) আহরণ কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার কুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবেশিত করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবেশিত করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। (১৪) তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শেরক অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। (১৫) হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্ গলগ্রহ। আর আল্লাহ্ তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ্ পক্ষ কঠিন নয়। (১৮) কেউ অপারের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না — যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্ত্রী কল্যাণের জন্যেই। আল্লাহ্ নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।

তাআলা তাকে সংকর্ষপরায়ণ সম্ভান-সম্ভতি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে। (অর্থাৎ, মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে-কাসীর উভয় রেওয়াজেত বর্ণনা করেছেন।) সারকথা, যেসব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ تَدْعُوهُمْ لِيَسْتَعْوِذَ أَعْمَاءُكُمْ وَلَوْ سَبِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُمْ

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর, বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমতঃ তারা শুনেই পারবে না। কেননা, মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা নেই। নবী ও ফেরেশতাদের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়, এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতঃপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্যে সুপারিশও করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয় — বিপক্ষেও নয়। সূরা রাসে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য

মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে : وَكُلُّ مَنٍ أَثْمَلُهُمْ وَأَثْمَلْتُمْ أَثْمَالَهُمْ অর্থাৎ, যারা পঞ্চবট করে, তারা নিজেদের পঞ্চবটতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পঞ্চবট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পঞ্চবট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে। বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে, কিন্তু পঞ্চ-বটকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে — একটি পঞ্চবট হওয়ার ও অপরটি পঞ্চবট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লেখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ক্ষণ অসংখ্য। আমার জন্যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অতঃপর পিতা বলবে, বৎস, আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন — কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতঃপর আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার সহধর্মীনির্কেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মীণীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۗ
وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ۗ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَلَا الْأَبْصَارُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي
الْقُبُورِ ۗ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۗ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۗ
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۗ ثُمَّ
أَخَذْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابَ الَّذِينَ أَلْمَزْنَا
اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهَا ۗ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۗ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۗ إِنَّ الَّذِينَ
يَشْكُرُونَ كَتَبْنَا لَهُمُ السَّلَامَةَ وَالصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِنَّا
رِزْقًا فَتَنَّهُمْ صَبْرًا وَعِلَاقِيَةً يُرْجُونَ بِنَارِهِ لَأَن يُؤْرَثُوا

(১৯) দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। (২০) সমান নয় অন্ধকার ও আলো।  
(২১) সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (২২) আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪) আমি আপনাকে সত্যখবরসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (২৫) তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন। (২৬) অতঃপর আমি কাকেরদেরকে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল আমার আযাব। (২৭) তুমি কি দেখনি আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল-মূল উদ্ভব করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ — সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ, (২৮) অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। (২৯) যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না।

হযরত ইকরিমা বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ বাকের অর্থ তাই। কোরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ এ আয়াতের শুরুতে কাকেরদেরকে মৃতদের সাথে এবং মুমিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَن فِي الْقُبُورِ (কবরস্থ লোক)—এর অর্থ হবে কাকের। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাকেরদেরও বোঝাতে পারবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো।

فَل-মূলের الوان اختلاف الوان তথা বর্ণ

বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে مختلف শব্দটিকে منصوب উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির اختلاف তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে صفت এর আকারে مختلف অর্থাৎ, মرفوع বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফল-মূলের বর্ণ-বৈচিত্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না— প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীব-জন্তুর বর্ণ সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جلة এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جاده ও বলা হয়। কেউ কেউ جلة এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مَخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু’টি— সাদা ও কাল। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দু’টির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রনে গঠিত হয়।

كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অধিকাংশ তফসীর-বিদের মতে এখানে كَذَلِكَ শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তাআলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোন কোন রেওয়াজে থেকে বোঝা যায় যে, كَذَلِكَ শব্দের সম্পর্ক পূর্ববর্তী বাকের সাথে। অর্থাৎ, ফল-মূল, পাহাড়, মানুষ, ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার খোদা-তীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে। — (রুহুল-মা’আনী)

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ إِنَّمَا يُنذِرُ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ কে সাধুনা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা খোদাতীতি

অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে গুলী-আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। ﴿سَمًا﴾ শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়া প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ﴿سَمًا﴾ শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ খোদাতীতি আলোমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয় তার মধ্যে খোদাতীতি না থাকা জরুরী হয় না।— (বাহরে মুহীত, আবু হাইয়ান।)

আয়াতে علماء বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্তন ও আল্লাহর দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মারফত উপরোক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ খোদাতীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়াজে ও অধিক জ্ঞান দ্বারা খোদাতীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কোরআন ও সূরাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়।— (ইবনে-কাসীর)

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন— এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে খোদাতীতি নেই, সে আলেম নয়।— (মাযহারী)

তবে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহর ভয় নেই; এমনও তো অনেক আলেম দেখা যায়— উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা, উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কাছে কেবল আরবী জ্ঞানার নাম এলম এবং যে তা জানে তার নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে আলেমই নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্যে জরুরী। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম— জরুরী নয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

পূর্ববর্তী এক আয়াতে খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানী হক্কানী আলোমগণের একটি বৈশিষ্ট্য—আল্লাহর প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক ছিল অস্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্ক দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ, এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তেলাওয়াতে কোরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কোরআন

তেলাওয়াত করে।

দ্বিতীয় গুণ নামায কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে ‘গোপনে ও প্রকাশ্যে’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অধিকাংশ এবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগীতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরী হয়ে যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জমাআতে নামায আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্যে মাঝে মাঝে আল্লাহর পথে প্রকাশ্যে দান করা জরুরী হয় যায়। নামায ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফেকাহবিদগণ বলেন, ফরয, ওয়াজিব ও সুনতে মুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামায ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরোক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর বলা হয়েছে ﴿رُؤُوسَ جَارَاتٍ لَّنْ نَّبُورُ - نَبُورُ﴾ শব্দটি بوار থেকে উদ্ভূত।

অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশংকা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মুমিনের জন্যে কোন সংকাজে সওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিস কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহর মহিমা ও প্রাপ্য এবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মগফেরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সংকর্মে গোপন শয়তানী অথবা রিপূগত চক্রান্তও शामिल হয়ে যায়। ফলে সে সংকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সংকর্মের পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সংকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে ﴿رُؤُوسَ جَارَاتٍ﴾ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সংকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে নিশ্চিত হওয়ার অধিকার কারও নেই— বেশীর চেয়ে বেশী আশাই করতে পারে।— (রুহুল-মা'আনী)

সংকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে : এ আয়াতে বর্ণিত সংকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে ঈমান এবং আল্লাহর পথে জেহাদকেও ব্যবসা বলা হয়েছে।

সংকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ের মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে ﴿رُؤُوسَ جَارَاتٍ﴾ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ের লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকা নেই। সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সংকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মত কোন ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। ‘তারা প্রার্থী— একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত সীমিত; কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশী দান করবেন।

لِيُرْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ  
 شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا  
 لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا  
 الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ  
 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذنِ اللَّهِ ذَلِكَ  
 هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ  
 فِيهَا مِنْ أَشْوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا مِسْجَرًا فِيهَا خَيْرٌ  
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا  
 لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُعَامَرَةِ مِنْ فَضْلِهِ  
 لِنَسْتَمْتِ فِيهَا أَنْصَبَ وَلِنَلْسُنَ فِيهَا الْعُتُوبَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ  
 عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ وَهُمْ  
 يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ  
 الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ  
 تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ مِنَ النَّارِ

(৩০) পরিপামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেন এক নিছক অনুগ্রহে আরও বেশী দেন। নিশ্চয় তিনি ক্রমশীল, গুণগ্রাহী।  
 (৩১) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য — পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, দেখেন। (৩২) অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ। (৩৩) তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জাহান্নাতে। তথায় তারা স্বপ্ননির্মিত, যেটি খচিত রংরঙ্গ দ্বারা অলঙ্কৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (৩৪) আর তারা বলবে— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা ক্রমশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (৩৬) আর যারা কাকের হয়েছ, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শান্তিও লাভ করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শান্তি দিয়ে থাকি। (৩৭) সেখানে তারা আতঁ চাঁককার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সংকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন), আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আশ্বাসন কর। জাহান্নামের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِيُرْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ এখানে لِيُرْفِيَهُمْ শব্দটি  
 ثُمَّ অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, তাদের ব্যবসায় লোকসান  
 তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরোপুরি দেয়ার  
 পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত অনেক বেশী দেন।

এই বেশীর মধ্যে আল্লাহ তাআলার সে সওয়াবও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা  
 হয়েছে, মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ তাআলা বহুগুণ বেশী দান করেন, যা  
 কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশীর পক্ষে সাতশ' গুণ বা তার  
 চেয়েও বেশী। অন্যান্য পাপীর জন্যে মুমিনের সুপারিশ কবুল করাও এ  
 অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত  
 আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে,  
 মুমিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মুমিন তার  
 জন্যে সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুমিনের  
 সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।—(মাযহারী)

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্যে হতে পারবে,  
 কাকেরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না।  
 এমনভাবে জাহান্নাতে আল্লাহ তাআলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের  
 প্রধান অংশ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا  
 পর সংযোগ স্থাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয়  
 বাক্য অভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী  
 বাক্যের বিষয়বস্তু পূর্বে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায়।  
 অতঃপর এই পূর্বাপর কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও  
 স্তরের দিক দিয়েও হয়। এ আয়াতে ثُمَّ অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত  
 أَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عطف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও  
 পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার কাছে  
 প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর  
 অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে  
 রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রা  
 এবং উম্মতে মোহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে  
 কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)  
 উম্মতের জন্যে অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার  
 পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষতঃ আলেমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ  
 বৈশিষ্ট্য : الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে  
 যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ  
 নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য  
 মুসলমানগণ আলেমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে  
 আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে  
 মুহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর প্রত্যেকটি  
 অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ, কোরআন পূর্ববর্তী  
 সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সত্রকক বিধায় সমস্ত ঐশীগ্রহের বিষয়বস্তুর  
 সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই

উত্তরাধিকারী হওয়া।) অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস বলেন :

“এ উম্মতের যালেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে, মধ্যপন্থীদের হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে, আর যারা সংকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।—(ইবনে-কাসীর)

আয়াতের **اصْطَفَيْنَا** শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা, এ শব্দটি কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে — **اللَّهُ**

**يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ** অন্য এক আয়াতে আছে :

**إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ**

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা উম্মতে-মুহাম্মদীকে **اصطفاه** অর্থাৎ, মনোনয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার : **فِيْنَهُمْ طَائِفَةٌ لَمْ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ وَلَكِنِ الْبَرَاءَةُ**

এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, আমি যাদেরকে মনোনীত করে কোরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। যালেম, মধ্যপন্থী ও সংকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে-কাসীর এই প্রকারত্রয়ের তফসীর এভাবে করেছেন : যালেম সে ব্যক্তি যে কোন কোন ফরয ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থী সে ব্যক্তি, যে সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মাকরুহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সংকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোন কোন মোবাহ বিষয়, এবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়।—(ইবনে-কাসীর)

একটি সন্দেহ ও তার জগ্নাব : উল্লেখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, যালেমও আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যতঃ অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, যালেম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং **اصْطَفَيْنَا** গুণের বাইরে নয়। এটি হল উম্মতে মুহাম্মদীর মুমিন বান্দাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যতঃ ত্রুটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে-কাসীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলেম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর কিতাব ও রসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে - **ورثة الانبياء** - এর সারমর্ম এই যে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লবা ইবনে হকাম (রাঃ) বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা

আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্যে রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই কর না কেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে আলেমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ তীতির রঙে রঞ্জিত আলেমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসেবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুল-ত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফেরাত তোমাদের জন্যে অবধারিত।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হাশরে আল্লাহ তাআলা সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আলেমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন :

“আমি তোমাদের অন্তরে আমার এলেম এ জন্যে রেখেছিলাম যে, আমি জানতাম (যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে।) তোমাদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে তোমাদের বক্ষে আমি আমার এলেম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।—(মায়হারী)

জ্ঞাতব্য : আয়াতে সর্বপ্রথম জালেম, অতঃপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থী ও সর্বশেষে সংকর্মে অগ্রগামী উল্লেখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যালেমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী মধ্যপন্থী এবং আরও কম সংকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশী, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

**ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَدَّتْ عَيْنٌ يَدَّ خُلُوْهَا يُحْكُونَ وَبِهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزُؤُفُؤٍ وَكَيْسَمٍ وَمِنْهَا حُرِيُّو**

অর্থাৎ, শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন - **ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ**

**الْكَبِيرُ** অর্থাৎ, এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ তাআলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কঙ্কন এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোষাক হবে রেশমের।

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোষাক উভয়টি পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্যে শোভনীয় নয়। কেননা, দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত ও পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়াজেতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে।—(মায়হারী)

তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কঙ্কন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।—(ক্বুতুবী)

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, রেশমী পোষাক পরিধান

করো না; সোনা-রূপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরী পাত্রে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে পরকালে। — (বোখারী-মুসলিম)

وَأَلْوَالِحُنَّ الَّذِينَ آذَهُبَ عَنَّا الْحَزَنُ — অর্থাৎ, জান্নাতীরা

জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

এ কারণেই সূফীবর্গ দুনিয়াকে “দারুল-আহযান” দুঃখ কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লেখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমতঃ দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়তঃ কেয়ামত ও হাশর-নশরের দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়তঃ হিসাব-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবং চতুর্থতঃ জাহান্নামের শাস্তি ও দুঃখ কষ্টও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে কোথাও উৎকর্ষা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে উঠার সময় **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَهُبَ عَنَّا الْحَزَنُ** বলতে বলতে উঠছে। — (তিবরানী, মাযহারী)

হযরত আবুদ্বারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লেখিত যালেম শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির এ উক্তি করবে। কেননা, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, যালেম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী ও যালেম সকল শ্রেণীর জান্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদা হওয়া অবাস্তব নয়।

ইমাম জাসসাস বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মুমিনের শান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, দুনিয়া মুমিনের জন্যে কয়েদখানা। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাদেরকে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা যেত।

الَّذِي أَحْكَمَ أَدَارَ الْمَعَامَةِ مِنْ قَضَائِهِ لَيْسَتْ نَافِيَهَا نَصَبٌ  
وَلَيْسَتْ نَافِيَهَا نَوْبٌ

আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। (এক) জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিস্কৃত হওয়ার কোনও আশংকা নেই। (দুই) সেখানে কেউ কোন দুঃখের সম্মুখীন হবে না। (তিন) সেখানে কেউ কোন ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোন কোন হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে। — (মাযহারী)

أَوْ لَمْ نَعْبُدْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّبِيُّ

জাহান্নামে যখন কাফেররা ফরিযাদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা; আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ আঠার বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফেরদেরকে উপরোক্ত কথাটি বলা হবে, তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সতের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ষিকারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ তাআলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আযাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহর প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গোনাহ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা যে বয়সে গোনাহগার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাসও এক রেওয়াজেতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়াজেতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে কোন ওয়র আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে-কাসীর হযরত ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় রেওয়াজেতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

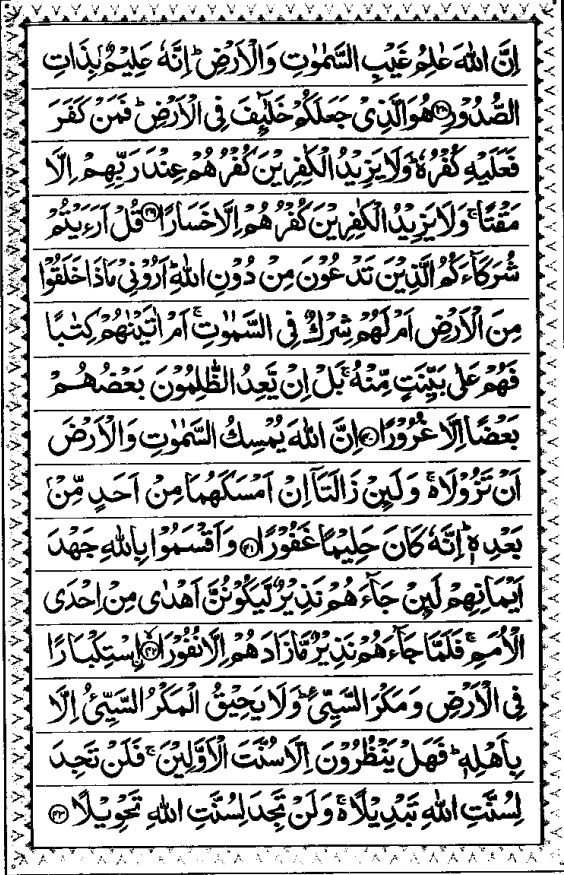
উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠারো বছর সংক্রান্ত রেওয়াজেতও ষাট বছরের রেওয়াজেতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সতের পরিচয় লাভ না করলে তার ওয়র আপত্তি করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে **وَجَاءَكُمْ النَّبِيُّ** এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্যে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্যে ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন। “নবীর” শব্দের অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নবীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে নিজের লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েব আলেমগণকে বোঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্যে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছি, পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

فاطره

৩৩-

ومن تقيت ۳۳



(৩৮) আল্লাহ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অস্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদেরকে কোন কিভাবে দিয়েছি যে, তারা তার দলীলের উপর কায়ম রয়েছে, বরং জ্বালেমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশালী। (৪২) তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করলে তারা অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সম্পৃক্তে চলবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করল, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল। (৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কূচক্রের কারণে। কূচক্র কূচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর বিধানের পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেননা।

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর خلیفة শব্দটি هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ

বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ তাআলার দিকে রুখু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাপালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না।

إِنَّ اللَّهَ يُرْسِدُ السَّمَوَاتِ — আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ

নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেয়া হয়েছে, বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া। — لَا يَجِئُ لَكُمُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল — এ বিষয়ের কোন প্রশ্ন নেই।

لَا يَحِيطُ بِشَيْءٍ وَلَا يَجِئُ — وَلَا يَجِئُ لَكُمُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

কিবেলা — অর্থাৎ, কূচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না — কূচক্রীর উপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়।

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কূচক্রীদের চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায়। এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, এটা তুচ্ছ ক্ষতি। আর কূচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আখাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তার উপর যুলুম করার প্রতিফল জ্বালেমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন : তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। (এক) কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেয়া, (দুই) যুলুম করা এবং (তিন) অস্বীকার ভঙ্গ করা।— (ইবনে-কাসীর)

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি ; বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।